সমকাল

তারিখ ... 19 OCT 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# নির্বাচন ও শিক্ষাঙ্গনের চাওয়া-পাওয়া

শিক্ষা | মো. মাসুদ পারভেজ রানা

সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আরেকটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন সমাগত। সরকারি ও বিরোধী দল নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশে মত্ত। বিরোধী দলের ফাইনাল খেলা আর সরকারি দলের জয়ের ট্রফি ধরে থাকার লড়াই। প্রশ্ন হলো, এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ কতটুকু? সাধারণ জনগণের স্বার্থই-বা কী? যেখানে নির্বাচনের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ থাকার কথা সংবিধানে, সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দফারফা হবে রাজনৈতিক দলীয় সভায় অথবা রাজপথে! আমরা কতটা অসহায় যে, স্বাধীনতার এত বছর পরও নির্বাচন কীভাবে হবে তার সাংবিধানিক সুরাহা করতে পারিনি! রাজনৈতিক দলগুলো কতটা বিপথগামী এবং স্বার্থান্বেষী যে, ক্ষমতার লোভ তাদের জনগণের শক্তিরূপে আবির্ভূত করতে পারেনি! আমরা কতটা আবেগকাতর যে, ভালো-মন্দ বিচার না করেই প্রতিটি নির্বাচনে প্রতীকী সমর্থন দিয়ে চলেছি। আমরা কখনও কি ভেবে দেখেছি, আমরা যা চেয়েছিলাম তার কতটুকু এই রাজনৈতিক দলগুলো দিয়েছে? এই নির্বাচনেও আমরা ভোট দিতে চাই। কিন্তু কাকে সমর্থন দেওয়া উচিত হবে সেই হিসাব-নিকাশ করব কখন? এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমাদের দাবি-দাওয়াই-বা কী হবে? আসুন দেখি, উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে গত পাঁচ বছরে কী হয়েছে, আর এবার আমরা কী চাইতে পারি। দিনবদলের অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তথা ১৪ দল সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিল। জনগণ নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়েছিল পুরনো জঞ্জালকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার আশায়। জনগণের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, অতীতের ব্যর্থতার আলোকে নতুন সরকার নতুন ধারণার জন্ম দেবে, নিয়ে আসবে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকবে না কোনো সেশন-জ্যাম, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। থাকবে না ছাত্র-শিক্ষকদের অশালীন রাজনৈতিক দৌরাত্ম্য। কিন্তু আমরা কী পেয়েছি? এ প্রসঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা সেখানে দেখেছি ছাত্ররাজনীতির চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। অভ্যন্তরীণ কোন্দল অথবা প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেছে বেশ কিছু ছাত্রের। আহত হয়েছে অনেক ছাত্র। আমরা দেখেছি ছাত্ররাজনীতির একদলীয় অবস্থান, যেটা নিশ্চিত করেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার বরখেলাপ। ছাত্রজীবনে একদলীয় রাজনৈতিক চর্চার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে যোগ্য রাজনীতিবিদ হয়ে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক তা উপলব্ধি করতে বড় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। অপেক্ষাকৃত তরুণ রাজনীতিবিদদের দেশ বিনির্মাণে রাজনীতিক হয়ে ওঠার বদলে ব্যবসায়িক রাজনীতিক হয়ে ওঠার প্রবণতা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি। ছাত্ররাজনীতি করার বর্তমান উদ্দেশ্য অতি অল্প সময়ে বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেকটি ছাত্ররাজনৈতিক দলে অছাত্র এবং ফেল করা ছাত্রদের অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় ছাত্ররাজনীতিতে মেধাবীদের অংশগ্রহণ কতটা কম।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসি ও প্রোভিসি নিয়োগ এখন রাজনৈতিক চক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা লক্ষ্য করেছি, রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত ভিসি ও প্রোভিসি যতটা না বিশ্ববিদ্যালয়ের, তার চেয়ে ঢের বেশি রাজনৈতিক দলের। তাদের কর্মকাণ্ডে মনে হয়, তারা শিক্ষা বা গবেষণার জন্য পরিচালিত নয়, বরং সরকারদলীয় রাজনীতির জন্য পরিচালিত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাদের একমাত্র কর্মকালো রাজনৈতিক প্ররোচনায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাকরি দেওয়া। গত পাঁচ বছরে আমরা দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কীভাবে শিক্ষা বা গবেষণাস্থল না হয়ে শুধু রাজনৈতিক কর্মস্থলে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দীর্ঘ হচ্ছে, কর্মরত শিক্ষকরা উচ্চতর গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারছে না। তাহলে এই কি ছিল আমাদের প্রত্যাশা, এই কি হওয়া উচিত রাজনৈতিক অর্জন?

সাম্প্রতিক কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আমাদের বুঝিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ভিসি বা প্রোভিসি কতটা শিক্ষক-হিতৈষী, শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে কতটা আন্তরিক এবং রাজনীতিক-ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষকদের সম্পর্ক কতটা মধুর! বোঝা যায়, ছাত্ররাজনীতি ক্যাম্পাসের সাধারণ দাবির চেয়ে কেন্দ্রীয় রাজনীতিবিদদের আদেশ পালনেই বেশি অনুরাগী।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ভিসি বা প্রোভিসি নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপরে ছেড়ে দেওয়া উচিত। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সিনেট নির্বাচনের মাধ্যমে ভিসি বা প্রোভিসি নিয়োগের যে বিধান আছে তা অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য। রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত ভিসি বা প্রোভিসিরা মনে করেন, তারা রাজনৈতিক সামগ্রী এবং তদনুযায়ী সরকারদলীয় রাজনীতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বাধ্য হন। এই সুযোগে রাজনীতিবিদরাও বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের হাতের মুঠোয় রেখে সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে চান। শিক্ষক নিয়োগে আগে যেখানে ক্লাসে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়কে প্রাধান্য দেওয়া হতো, সেটি আর এখন বহাল নেই। বরং রাজনৈতিক যোগসাজশে কে কতটুকু এগিয়ে সেটিই এখন মুখ্য নির্ধারক। তাহলে, এটাই কি ছিল পরিবর্তনের অঙ্গীকার, এটাই কি আমাদের প্রাপ্তি?

আসুন, আমরা সবাই রাজনীতিবিদদের কাছে এসব সমাধানের দাবি তুলি। আমরা অঙ্গীকার করি, আমরা সেই দলকে ভোট দেব যেটি উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিক্ষেত্র না বানিয়ে শিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে সমস্ত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পরিহার করবে; শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক ও ছাত্র রাজনৈতিক চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করবে; কেন্দ্রীয় রাজনীতির ক্রীড়নক না বানিয়ে, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ রাজনীতির যোগ্য উত্তরসূরি হওয়ার সুযোগ করে দেবে। আমরা সেই দলকে ভোট দেব যেটি শিক্ষকদের রাজপথের আন্দোলনে শরিক হওয়ার বদলে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাঠামো রচনায় এবং দেশের উন্নয়নে গবেষণা করায় উৎসাহ দেবে। এছাড়া আমরা সেই দলকেই সমর্থন দেব যেটি সর্বক্ষেত্রে অধিকতর মেধাবীদের মূল্যায়ন করবে। পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে আমার বিনীত আবেদন– আসুন, রাজনৈতিক বা দলীয় পরিচয় ছেড়ে আমরা শিক্ষক হই, গবেষক হই; আর সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনায় রাজনীতিবিদদের সহায়তার প্রয়াসে নিজ দায়িত্ব পালন করি।

mprgesru@yahoo.com